রবীন্দ্র, অজ্ঞাতজনের লহো নমস্কার

১ম পর্বঃ রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনা (১ম অংশ)

অজয় রায়

প্রায় ৯৯ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক অরবিন্দ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন একটি কবিতার মধ্য দিয়ে– তার প্রথম চরণটি ছিলঃ

" অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।"

কবিগুর"র সেই অমর বাক্যটি (নমস্কার, শান্তিনিকেতন, ৭ই ভাদ্র, ১৩১৪) ব্যবহার করে কবির ১৪৫তম জন্ম জয়ন্তীতে এই অধম তাঁর প্রতি প্রণতি জানাে'ছ "*রবীন্দ্র, অজ্ঞাতজনের লহো নমস্কার*"। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে একটি প্রবচন রয়েছে "গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো"। রবীন্দ্রনাথ তো স্রোতস্বীনি গঙ্গা নন, তিনি বিশাল সমুদ্র। তাই তাঁরই বারিবিন্দু দিয়ে আমার রবীন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই শ্রদ্ধার্ঘের প্রথম নিবেদন 'রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনা'

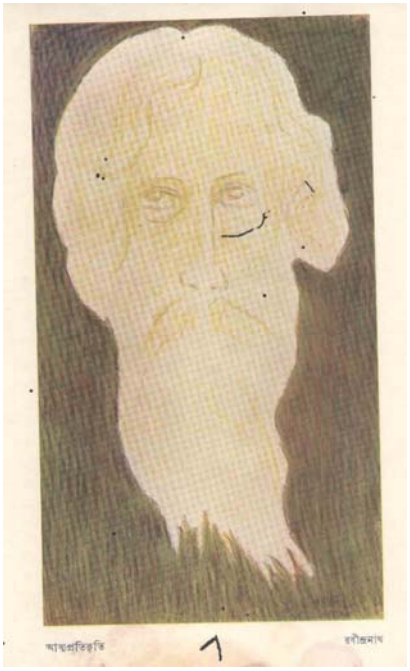

চিত্র ১ : আত্মকৃতি রবীন্দ্রনাথ

অনেক মনীষী বলে থাকেন শুধু মাত্র মাষ্টার মশাই'র কাছ থেকে বা শিক্ষায়তনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভই শিক্ষা নয়। মানুষ বস্তুত সবচাইতে বেশী শিক্ষা লাভ করে স্বচেষ্টায়, বিভিন্ন প্রন্থ-লেখা পাঠ করে, এবং পরিপার্শ্ব ও পরিবেশ থেকে- প্রকৃতি হল মানুষের সবচাইতে বড় শিক্ষক। মনীষীদের লেখা ও চিন্তা-ভাবনা শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের এক অনন্ত উৎস যা এবটি মানুষ সারা জীবন ব্যবহার করতে পারে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের কাছে ১৯২৪ সালে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন

> ' .. .. যদিও আমি আপনার কাছে সম্স্লুর্ণ অপরিচিত তবুও এ ধরণের অনুরোধ করতে আমার কোন সঙ্কোচ হ"ছে না, কারণ আপনার লেখার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই আপনার ছাত্র।'

আর একারণেই তিনি বরাবর আইনস্টাইনকে 'গুর"দেব' (Dear Master) বলে সম্বোধন করে এসেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহের" উল্লেখ করেছেন যে জর্জ বার্নাড শ'র লেখায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে শ'কে লেখা একটি চিঠিতে নেহের" জানিয়েছেন,

> " .. .. এ যুগের অনেকেরই মতো আপনার রচনাবলীর সাহচর্যে আমরা বর্দ্ধিত হয়েছি। আমার তো মনে হয়, আজ আমি যা হয়েছি তার কতকটা সেই পড়ার গুণে। অবশ্য এতে আপনার গৌরব বাড়বে কি না তা আমি জানিনে। .. .. একদিক থেকে .. .. আমি বরাবরই আপনার সান্নিধ্য পেয়ে এসেছি। আর কিছু না হোক চিন্তার দিক থেকে তো বটেই। অনেক সময় ই"ছা হয়েছে ... আপনার সঙ্গে দেখা করি; কিন্তু সুযোগ সুবিধা হয়ে ওঠেনি। আর তাছাড়া এই ভেবেছি যে আপনার গ্রন্থাবলী পড়লেই সব চেয়ে সহজে আপনার সান্নিধ্যে আসা যাবে। "

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বারবার প্রকৃতি থেকে শেখার ওপর জোর দিয়েছেন। আর এ কারণেই তিনি শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন শহরের কোলাহল থেকে অনেক দুরে প্রকৃতির কোলে বোলপুরের শান্তিনিকতেন গ্রামে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙ্গালীর জীবন অচল। আমাদের জীবনের হেন দিক নেই যাঁ তার কলম স্পর্শ করেনি। শিক্ষা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। তাঁর কালের প্রাতিষ্ঠানিক গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বির"দ্ধে তাঁর লেখনী সব সময় সো"চার ছিল। বিদ্যলয়গুলি তাঁর দৃষ্টিতে 'অচলায়তন', এদেরকে অভিহিত করেছেন 'শিক্ষার কারখানা' নামে। তিনি বলতেন,

"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।"

রবীন্দ্রনাথ সেকালে ইস্কুলের যে চিত্র এঁকেছেন আজকের ইস্কুলের হাল দেখলে মুখে কুলুপ আটতেন। সেকালে তবু সেটি এক ধরণের কল ছিল, আজ এরা 'বিকল' গোশালায় পরিণত হয়েছে। এখন এসব বিকল গোশালায় বিদ্যা তৈরী হয় না, ভেজাল বিদ্যা বিক্রয় হয় নানা চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। হতভাগ্য অভিভাবকেরা তা বাধ্য হয়ে কেনেন। ইস্কুল সম্পর্কে এ ধরণের নেগেটিভ রবীন্দ্রচিন্তার পশ্চাতে কারণ হল রবীন্দ্রনাথের ধারণায় ইস্কুলগুলো হল সমাজবি"ছিন্ন। তাঁর ধারণায়,

".. .. বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব।"

রবীন্দ্রনাথের উষ্মা বস্তুত আমাদের দেশে পশ্চিমী সংস্কৃতিতে পুষ্ট স্কুলের আদলে এদেশে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর প্রতি। অন্যদিকে, ইউরোপীয় পরিবেশে এই স্কুল থেকে প্রাপ্ত বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, কারণ স্কুলগুলোর সাথে ছিল সমাজের নিবির সম্পৃক্ততা। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে উ"ছসিত প্রশংসা শোনা যায় ইউরোপীয় স্কুল সম্স্লর্কে,

"য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বি"ছিন্ন নহে--- সেইখানেই তাহার চ"র্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে--- সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে.. .. .. ।"

য়ুরোপীয় ও মার্কিনী নামের বাহারী বিশ্ববিদ্যালয, এ-ও লেভেল আর কিণ্ডারগার্টেন নামক পরগাছা বিদ্যায়তনগুলো আজ যদি রবীন্দ্রনাথ দেখতেন, নিঃসন্দেহে মু"র্ছা যেতেন। তার মতে সেসময় ইংরেজরা যেমন নিজেদের প্রয়োজনে কল-কারখানা স্থাপন করেছিলেন, তেমনি ইংল্যাণ্ডের ধাঁচে ইস্কুল স্থাপন করেছিলেন পশ্চিমী দর্শন আর ঐতিহ্য অনুযায়ী-- দেশের সংস্কৃতি-দর্শনকে তোয়াক্কা না করে। রবীন্দ্রনাথের এখানেই ছিল আপত্তি, -- ভিনদেশের গাছ ভিন্ন পরিবেশে অন্য প্রকৃতিতে বাঁচে না। একথাটিই তিনি প্রকাশ করেছেন,

" এজন্যই বলিতেছি. য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল .. .. সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।"

তাই বলে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যয়তনকে, যেখানে মুলত গুর"র কাছে বসে তপবনে বিদ্যালাভ করা যেত, তিনি অতীতের বিদ্যয়তনকে বর্তমান ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে চান নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে, " ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোন কাজেই লাগিবে না।" এই দুই বৈপরত্যের একটি সমন্বয় করে অর্থাৎ পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের ধ্যান ধারণাকে সম্পৃক্ত করে তিনি চাইতেন এক ধরণের শিক্ষা দর্শন গড়ে তোলা যা হবে বিশ্বজনীন। রবীন্দ্রভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেনঃ

> "অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যলয় গ্রহণ করে। "

এ কারণেই হয়তো ব্রিটিশ পুর্ব আমলের টোল-পাঠশালা-মক্তব-মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষাকেও যেমন মেনে নিতে পারেন নি তেমনি ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজীয় প্রতিষ্ঠান নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতিকে'ও তাঁর কাছে সন্তোষজনক মনে হয় নি। এই পদ্ধতিকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে সমাজ-মানুষ-প্রকৃতি বি"ছিন্ন, বড্ড বেশী পুথি-বই-পুস্তক নির্ভর; এই প্রণালীতে শিক্ষাদান মুখস্ত প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে, শিক্ষার্থীর মনোবিকাশের যা অন্তরায়। তিনি মনে করতেন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা হয়তো ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজন মেটায়- কিন্তু এই শিক্ষা তোতাপাখীর মত পুথির কথা মুখস্ত করে পরীক্ষার সময় উগরে দেয়ার বিদ্যা, প্রকৃত মানুষ সৃষ্টির বিদ্যা নয়। এরই বির"দ্ধে স্বাদেশিকতার আন্দোলন কালে একই সাথে শিক্ষার আধুনিকরন ও ভারতীয়করণের যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের ছিলেন এক কর্মিষ্ঠ সাহসী অংশীদার। শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা, ধারণা ও সমস্যা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি ও বক্তৃতা দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষা সমস্যা সমাধান যে কত জর"রী সে নিয়ে 'রাশিয়ার চিঠি'র এক স্থানে তাঁর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছিলেন,

> " .. .. আমার মতে এই যে ভারতবর্ষের বুকের উপর যত-কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হ'ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। .. ।"

মুখস্তবিদ্যা কি ভাবে আমদের মন ও চিত্তবিকাশের পথকে অবর"দ্ধ করে তোলে তা 'তোতাকাহিনী'তে প্রকাশ করেছেন।

আমি আগেই বলেছি প্রকতি হল রবীন্দ্র মানসের এক বড়সড় রাজ্য। তাই রবীন্দ্র শিক্ষা-ভাবনার একটি বড় দিক অধিকার করে আছে শিক্ষার্থীর সাথে মানুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা। শিশুমন যে নিজের বদ্ধ আলয়ের বাইরে বর্হিবিশ্ব ও বর্হিপ্রকৃতির সাথে মিশবার ও জানবার জন্য সতত আকুলি বিকুলি করে- শিশু মনস্তত্ত্বেব এই গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন 'ডাকঘরে'র শিশু অমলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অমলের মত বাংলাদেশের শিশুরা নিজালয়ে ও শিক্ষায়তনের নামে বন্দীশালায় আবদ্ধ। সম্ভবত প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও অনুরাগ থেকে তাঁর মনে স্কুলভবন নির্ভর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যান্ত্রিক প্রণালীর উপর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই যে বিদ্যানিকেতনের কথা তিনি ভাবতেন তা অবশ্যই গড়ে উঠবে প্রকৃতির কোলে শহর থেকে দুরে কোথাও; তাঁর মতে,

> "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দুরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচ"র্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের নামই হল "শান্তিনিকেতন", যে কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল,

> "আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।"

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত বই ছাড়া অন্য বই পাঠে নির"ৎসাহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্স্লর্কে অতি তিক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন,

> "বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না। পৃথিবীর পুস্তক সাধারণকে পাঠ্য পুস্তক ও অপাঠ্য পুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা যায় না। .. .. কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে; .. .. কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য সম্পর্কীয় কোন কাজে কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যাই নাই। .. .. অতএব কমিটি নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্যরসবর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব। আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না; 'সুকুমারমতি' হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে। .. .. যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারার"দ্ধ হইয়া থাকা মানব-জীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমানে আবশ্যকশৃ•খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমান স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমান গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। .. .. শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না।"

আমাদের দেশের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষও এই মানসিকতায় আ”ছন্ন, ফলে শিশুদের স্কুল ব্যাগের বোঝা যেমন আয়তনে ও ওজনে বাড়ছে, মনের বিকাশ সে পরিমাণে বৃদ্ধি পা”ছ না, বরং দিন দিন সঙ্কুচিত হ”ছ।

হাতেখড়ি ও রবীন্দ্র ভাবনা :

শিশুর উপযোগী কী ধরণের পঠনীয় বই হওয়া উচিত বিদ্যাসাগরের মত তিনি মডেল বই রচনায় হাত দিয়েছিলন, আর সে চেষ্টার ফসল হিসেবে আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ রচিত শিশুদের জন্য লেখা ১ম-৪র্থ ভাগ বিশিষ্ট ‘সহজ পাঠ’ (বাংলা ১৩৩৭-৪৭) ও ইংরেজী সহজ শিক্ষা (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বাংলা ১৩৩৬)। তিনি বলেছেন সহজ পাঠ ১ম ভাগ পড়া শুর“ করতে হবে বর্ণ পরিচয়ের পর, মলাটে বলা হয়েছে “এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়”। সচিত্র এই পুস্তিকাগুলোর ছবি একেছিলেন নন্দলাল বসু। সহজ পাঠের প্রথম ভাগে কবি ‘অ আ’ র সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে শিশুর জন্য ছড়াটি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

“অ আ

ছোটো খোকা বলে অ আ
শেখে নি সে কথা কওয়া।”

বর্ণদুটির ঠিক ওপরে সাদা-কালোয় আঁকা একটি হামাগুড়ি দেয়া শিশু। ই ঈ পরিচয়ের জন্য নন্দলাল এঁকেছেন এক জোড়া ময়ুর, আর ছরাকারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

“ই ঈ

হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ
বসে খায় ক্ষীর খই।”

লক্ষ্যণীয় যে অক্ষরগুলোকে চেনাবার জন্য ব্যক্তিরূপ দেয়া হয়েছে, তারা ক্ষীর আর খই খা”ছ। আর বর্ণদুটির ব্যক্তি চিত্র দুটি ময়ুরের ছবি দিয়ে প্রকাশ করা হ”ছ। অনুরূপভাবে উ ঊ ছরার “হ্রস্ব

উ দীর্ঘ ঊ, ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেঊ" পাশে ঘেউ ঘেউ রত দুটি কুকুরের ছবি আঁকা হয়েছে। এভাবেই ক্রমশ স্বর বর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে শিশুর মনে একেঁ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ১৯ পৃষ্ঠা ধরে। বর্ণগুলোকে একসাথে লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়াস নেই। প্রথম পাঠ শুর" হয়েছে ২০ পৃষ্ঠায় ছড়া দিয়ে–

বনে থাকে বাঘ।
গাছে থাকে পাখি।
জলে থাকে মাছ।
ডালে আছে ফল।
পাখি ফল খায়।
পাখা মেলে ওড়ে।
... ...

এই ছোট ছোট বাক্যের মধ্য দিয়ে শিশুর চার পাশের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। এর পরে ছোট একটি গদ্য লেখার নমুনা ছোট সরল বাক্যে। এভাবেই ক্রমশ বড় বড় বাক্য আনা হয়েছে গদ্যে এবং পদ্যেও। ১০ম পাঠ দিয়ে শেষ হয়েছে 'সহজ পাঠ প্রথম ভাগ'। শেষ হয়েছে একটি বড় কবিতা দিয়ে যার শেষ অংশটি হলঃ

আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার।
কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে।

ধীরে ধীরে বিভিন্ন অক্ষর ও আ'কার, ই'কার, উ'কার ইত্যাদির সাথে পরিচয় গড়ে উঠেছে শিশুর। দশম পাঠে ঁ চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারের সাথে পরিচয় করানো হয়েছে বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে যেমন ঃ বাঁশগাছে বাঁদর; কাঁচা আম; আঁধার হল; ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস .. বাঁশি, কাঁসি, পেঁচা, কাঁদে ইত্যাদি। এর আগে ১ম পাঠে ওকার ('ো') আর ঔশার ('ৌ') কার - এদের সাথে পরিচয় ঘটানো হয়েছে শিশুকে। যেমন 'এসো এসো গৌর এসো। .. .. 'কোথা থেকে এলে গৌর? .. গৌরীপুর থেকে।- পৌষমাসে যেতে হবে গৌহাটি।

৫৩ পৃষ্ঠার সহজপাঠের ১ম ভাগ প্রথম প্রকাশ পায় বৈশাখ ১৩৩৭, আর সর্বশেষ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল বৈশাখ ১৪১০ সালে।

সহজপাঠের ২য় ভাগে শিশুদের ধীরে সরল যুক্তাক্ষর থেকে জটিল যুক্তাক্ষরের সাথে পরিচয় ঘটতে থাকে। প্রথম পাঠে ং সাথে পরিচয় ঘটে শিশুর, যেমন 'ঢং ঢং ক'রে নটা বাজল। .. .. বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি নয় ।' আবার ং এর উ"চারণ যে ঙ দিয়েও করা যায় তাও তিনি দেখিয়েছেন– 'মেঘের রঙ নীল। দ্বিতীয় পাঠে ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে 'য' (্য ফলা) মিলিয়ে যুক্তাক্ষরের গড়ন দেখিয়েছেনঃ দ + য = দ্য; ন+য = ন্য; উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, "আজ আদ্যনাথ-বাবুর কন্যার বিয়ে– তাঁর এই শল্যপুরের বাড়িতে। .. .. গল্পের মধ্য দিয়ে নানা শব্দ এনেছেন– সৌম্য, ব্যবসা, ধ্যান, পুণ্য, অবশ্য, শস্য, সাধ্য, নৃত্য, ব্যাটবল, ক্যাপটেন .. .. । এভাবেই বিভিন্ন পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমশ সব যুক্তাক্ষরের সাথে শিশুদের পরিচয় পর্ব সেরে নিতে থাকেনঃ যেমন ঙ+গ = ঙ্গ (সঙ্গে), ক+র = ক্র (শুক্রবার), ক+স = ক্স (বক্সী), ঞ+জ = ঞ্জ (গঞ্জ), দ+ম্ = দ্ম (পদ্ম), স+ত = স্ত— (সস্ত—া), চ+ছ = "ছ (উ"ছ), ন+ধ = ন্ধ (অন্ধ), ক+ষ = ক্ষ (ভিক্ষা), স+ন = স্ন (স্নান) । শেষ করেছেন সহজপাঠের দ্বিতীয় ভাগটি ত্রয়োদশ পাঠে একটি বড় কবিতা দিয়ে, যার প্রথম অংশটি হল–

অঞ্জনা-নদী-তীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল-ধরা – এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।

আর শেষ করেছেন, এ ভাবে –

কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি –
অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী ।
সেই গান মিলে যায় দুর হতে দুরে
শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্দুরে।

পড়ার মধ্যদিয়ে সমাজ সচেতনতা শেখারও প্রয়াস লক্ষ্যণীয় – যেমন তৃতীয় পাঠের প্রথমেই বলা হ"ছ ঃ "আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে।" কৃষিক্ষেত থেকে পঙ্গপাল বিতাড়নের কথাও বলা হয়েছে।

৬০ পৃষ্ঠার এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৩৭ সালে, আর শেষ পুনর্মুদ্রণ হয় আষাঢ় ১৪১১ সালে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ থেকে। এবারও ছবি এঁকেছেন নন্দলাল বসু- এবারের বৈশিষ্ট্য হলো এগুলি রেখাচিত্র যাতে শিশুরা রং দিয়ে ভরাট করে শিল্পীর আনন্দ পায়। এ প্রসঙ্গে প্রকাশকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "শিশুরা নিজে নিজে ছবিগুলি রঙ ক'রে নিতে পারবে ব'লে সেগুলি রেখায় আঁকা হয়েছে। এতে বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা ছবি আঁকার আনন্দও পাবে। "

সহজ পাঠের ৩য় ভাগ লিখতে গিয়ে কবি ধরে নিয়েছেন যে শিশু এখন বাংলা পড়াটা ভালভাবে রপ্ত করে ফেলেছে। তাই তিনি বাংলায় বিভিন্ন জনের লেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দি'ছেন কিছু কিছু নির্বাচিত সরল ছোট ছোট প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। সে দিক থেকে বিচার করলে এই ভাগটিকে একটি গদ্য-পদ্যের সরল সংকলন বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই ধারাটি কিন্তু পরবর্তীকালে বি. এ. ক্লাশ পর্যন্ত অদ্যাবধি অনুসৃত হয়ে আসছে উভয় বঙ্গের শিক্ষা বোর্ড ও পর্ষদ কর্তৃক। ২৫টি অন্তর্ভুক্ত লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন ১৩টি কবিতা এর মধ্যে তিনটিকে তিনি গান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মাত্র একটি গদ্য লিখেছেন 'আবদুল মাঝির গল্প' শিরোনামে। সংকলনটি শুর" হয়েছে দেশ বন্দনার মধ্য দিয়ে আর এর জন্য কবি নির্বাচন করেছেন তাঁর লেখা একটি গান, যার প্রথম পংক্তি হ'ছে– "সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এদেশে।" গানটির কয়েক ছত্র এই ফাঁকে শোনা যাকঃ

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে ।
সার্থক জনম মাগো,
তোমায় ভালোবেসে।

জানি নে তোর ধনরতন
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।

.. .. ..

কবিতাটি শেষ হয়েছে এভাবে।

আঁখি মেলে তোমার আলো

প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে।

মা জন্মভুমির একটি প্রতীক চিত্র এঁকেছেন নন্দলাল বসু শিশুক্রোড়ে এক মুগ্ধ বাঙালী জননীর।

চিত্র ২: জন্মভুমির মাতৃরূপ শিশুক্রোড়ে মা জননী

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যাদের রচনা সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন ঃ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (সর্দার মশাই), তেজেশচন্দ্র সেন (গণ্ডার শিকার), উপেন্দ্রনাথ দাস (শহুরে ইঁদুর ও গেঁয়ো ইঁদুর), প্রমথনাথ সেনগুপ্ত (শিশির কুয়াশা মেঘ বৃষ্টি), শ্রীক্ষিতীশ রায় (তেলে আর জলে, বরফের দেশ, মেঘমালা), তনয়েন্দ্র ঘোষ (জয়তিলক, কুকুর সম্বন্ধে দু-চার কথা), শ্রীপুণ্যময় সেন (গাছের বীজ কী ক'রে ছড়ায়), শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) – মোট নয় জন। সংকলনটি শেষ হয়েছে 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' – এই গানটি দিয়ে। আর এ গানটির স্বরলিপি করেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেটিও সংকলনে স্থান পেয়েছে সর্বশেষে। ৭২ পৃষ্ঠার এই পুস্তকটির প্রথম প্রকাশ ঘটে বাংলা চৈত্র ১৩৪৭' এ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ হয় ১৩৪৯ ও ১৩৫১ সালে। সংকলনটির বৈশিট্য জীব জানোয়ার, গাছ, প্রকৃতি নিয়ে রচনা স্থান পেয়েছে যেমন বাঁদর, গণ্ডার, ইঁদুর, বাঘ, কুকুর নিয়ে জীব জানোয়ারের ওপর, কৃষির কথা গাছ গাছালির কথা স্থান পেয়েছে গাছের বীজ কী

ক'রে ছড়ায় সুন্দর শিশুতোষ রচনাটিতে। কিজ্ঞান ও ভুপ্রকৃতির কথা এসছে 'বরফের দেশ' ও 'শিশির কুয়াশা মেঘ ও বৃষ্টি' রচনা দুটিতে। রূপ কথা স্থান পেয়েছে একটি গল্পে 'মেঘমালা', আর বড় মানুষের কথা বলা হয়েছে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' শিরোনামের পরিমিতি বোধে ভাস্বর জীবনালেখ্যে। পাশাপাশি এক জন সাধারণ অথচ অতিপরিচিত মানুষের কথা স্থান পেয়েছে সংকলনটিতে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র গদ্য রচনায়, যার শিরোনাম "আবদুল মাঝির গল্প"। এ মানুষটি আমাদের চেনা, অথচ কি অনন্য হয়ে দেখা দিয়েছেন কবির দৃষ্টিতে। এ রচনাটি আমাদের শেখায় শ্রমের প্রতি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করতে, আর শেখা মানবতাবাদের প্রথম পাঠ।

বরফের দেশ রচনাটিতে সুমের" দেশের কথা, গ্রীনল্যণ্ড দেশের কথা, ওখানকার অধিবাসী এস্কিমোদের জীবন যাত্রা, তাদের ঘরের কথা, সীল ও সিন্ধুঘোটক শিকারের কথা, বরফের ওপর চালিত কুকুর টানা স্লেজ গাড়ি, তাদের নৌকার কথা এসব বলা হয়েছে। মের" প্রদেশে ছয়মাস রাত, আর ছয়মাস দিনের এবং মের"জ্যোতির কথা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে উত্থাপন করা হয়েছে শিশুতোষ ভাষায়। বিজ্ঞানের কথা ও নিয়ম দিয়ে সুললিত ভাষায় বোঝানো হয়েছে শিশির, কুয়াশা আর মেঘের গঠনের প্রক্রিয়া; আকাশে জমা মেঘ থেকে কেমন করে বৃষ্টির ধারা পৃথিবীতে নেমে আসে তার কথা বলা হয়েছে। শিশুকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো কী ভাবে ঘটে, এর পশ্চাতে ব্যাখ্য কি । শিশির কী ভাবে তৈরী হয় সে প্রসঙ্গে বলা হ'ছ ঃ "শীতের রাতে ঘাসের উপর, গাছের পাতায়, আমরা শিশির জমতে দেখি। দিনের বেলা সুর্যের উত্তাপে মাটি গরম হয়, সুর্য অস্ত গেলে তাপ ছেড়ে দিয়ে ঐ মাটি ঠাণ্ডা হতে থাকে। শীতকালে শেষরাত্রির দিকে ঐ মটি এতটা ঠাণ্ডা হয় যে, তার সংস্পর্শে এসে হাওয়ার জলীয় বাষ্প জ'মে গিয়ে জলের কণার আকারে জমা হতে থাকে ঘাসে ও গাছের পাতায়। এই জলকণাকেই বলি শিশির।"

সহজ পাঠের শেষ বা ৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হয় বাংলা পৌষ ১৩৪৭ সালে। এটিও একটি সংকলন এবং লেখাগুলি আরও পরিপক্ক, এবং শুর" হয়েছে কবির একটি গান দিয়ে– "আমি ভয় করব না, ভয় করব না।"। গানের শেষ চরণে বলা হয়েছে–

"ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোণে সরব না।"

এখানে একটি চমৎকার কথা বলা হয়েছে– ধর্মকে নির্দেশিকা হিসেবে নয়, শ্রদ্ধাভরে মাথায় রেখে নিজের চলার রাস্তা স্থির করতে বলতে বলা হয়েছে, এবং ভগবান বা ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় না চেয়ে

বিপৎকালে সাহসের সাথে দাঁড়াতে শপথ নিতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের রচনা হিসেবে স্থান পেয়েছে উদ্ভিদ-রাজ্য, গরম জলে ও গরম হাওয়ায় স্রোতে, চুম্বকের ব্যবহার, উড়ো জাহাজ, চাঁদ ও চাঁদের কলঙ্ক, জীব জগতের সাথে পরিচয় নিগুড় করা হয়েছে ক'ছপের কাণ্ড, গেছো বাবা, কুকুর সম্বন্ধে দু'চার কথা, মাকড়সা প্রভৃতি চমৎকার রচনার মধ্য দিয়ে। ইতিহাস প্রসঙ্গ এসেছে 'সোহরাব র'স্তম' গল্প দুটির ভেতর দিয়ে। বড় মানুষের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে 'সম্রাট অশোক' ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক চার্লস ফ্রিয়র এণ্ড্রুজ' এর ওপর 'দীনবন্ধু' শিরোনামের দুটি রচনায়।

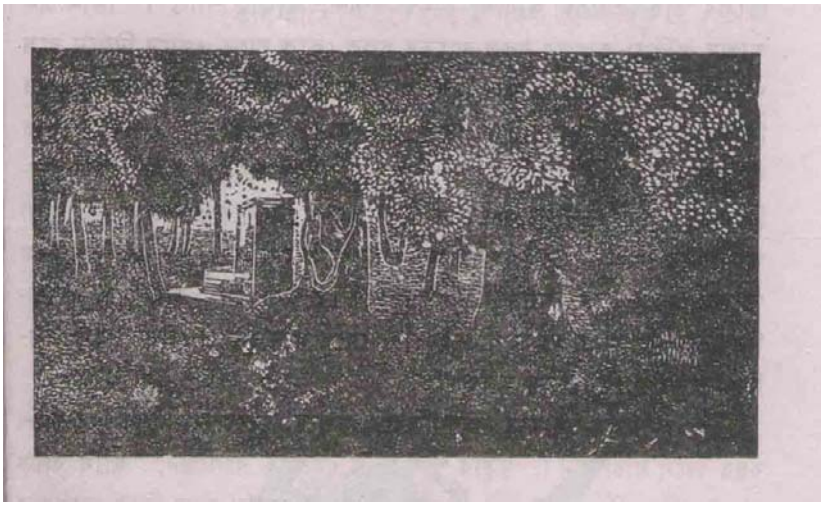

চিত্র ৩: শান্তিনিকেতনে ছাতিম তলায় দেবেন্দ্রনাথের পুরাতন আশ্রম

তেজেশচন্দ্র সেন লিখিত উদ্ভিদ রাজ্য রচনাটিতে চমৎকার ভাবে জীব হিসেবে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, তাদের আহার সংগ্রহ, আলোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরী ইত্যাদি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে– "আমরা যে প্রাণীজগতে বাস করি তার একভাগ জন্তুর, এক ভাগ উদ্ভিদের। এদের দুই পৃথক কোঠায় ফেললেও, এক জায়গায় এরা সমান, উভয়েই এরা প্রাণী।" বলা হয়েছে শেকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে গাছ আহার্য রসদ সংগহ করে, আর করে থাকে প্রধান প্রাণপদার্থ বাতাস থেকে, পাতার সাহায্যে। আমরা যারা ক্লোরোফিল বলি সে ও আলেক সংশ্লেষণ সম্স্লর্কে বলা হয়েছে– "গাছের পাতায় একরকম সবুজ পদার্থ আছে, জন্তুর তা নেই। .. .. অনেক গাছের ডাল ও গুঁড়ির ছালের রঙও সবুজ। .. এই সবুজ পদার্থের গুণেই উদ্ভিদ বেঁচে আঁছে। গাছের খাদ্য তৈরী হয় গাছের পাতায়। গাছ মাটি থেকে যে খাবার টেনে নেয় সে সব জিনিস কাঁচা মাল– অর্থাৎ সেগুলোর রূপান্তর ঘটছে তবেই তার ব্যবহার চলে। এই কাঁচা মালকে আলোর সাহায্যে খাদ্যে পরিণত ক'রে দেবার কাজ করে পাতা। পাতার সবুজ পদার্থ সূর্যকিরণ থেকে শক্তি সঞ্চয়

করে খাবার-পরিপাকের সাহায্য করে।" সহজ পাঠের ৩য় ভাগের লেখকরাই এই ভাগে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের ১৫টি কবিতা সংকলিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫টি গান। এর মধ্যে রয়েছে 'খরবায়ু বয় বেগে .. .. ', যার শেষ কয়েকটি লাইন আমাকে এখনও উদ্বেলিত করে ঃ

.. ..

যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল,
'জয় জয় জয়গান গাইয়ো–
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

শান্তিনিকেতনের ওপর চমৎকার একটি ছোট মনোজ্ঞ প্রবন্ধ দিয়ে ৮৭ পৃষ্ঠার এই সংকলনটি শেষ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে কবি ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন মাত্র দুজন শিক্ষক ও পাঁচজন বালক ছাত্র নিয়ে যার মধ্যে ছিলেন কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথও। প্রাচীন ভারতের দুরে লোকালয়ের বাইরে 'তপোবনের' আদর্শে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত এক ব্রহ্মচারী – ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লেখাটি, বর্তমানে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪০ বছর পরে লেখা। শান্তিনিকেতনে পাঠরত ছাত্রদের থাকার জন্য আবাস তৈরী হয়েছিল প্রথম থেকেই– বর্তমানে এই ভবনটির নাম 'সন্তোষালয়'। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ছিলেন প্রথম যুগের আর একজন ছাত্র, যিনি পরে বিদ্যালয়টির শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আশ্রমের উন্মুক্ত প্রান্তরে গাছতলায় বিশেষভাবে তৈরী বেদীতে বসে ছাত্ররা গুর"র চারপাশ ঘিরে পাঠ নিত। ছাত্র-শিক্ষক মিলিত ভাবে বেদগান গেয়ে স্কুলের কার্যক্রম শুর" হতো। রবীন্দ্রনাথ নিজে মাঝে মাঝে মুখে মুখে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে কোমলমতি ছাত্রদের বাংলা, ইংরেজী শেখাতেন। এ সময় তিনি ছাত্রদের জন্য 'ইংরাজি-সোপান', ইংরেজি সহজ শিক্ষা' নামে অনেকগুলো বই লিখেছিলেন। কবি ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতেন, নিজে বিজ্ঞানের ক্লাশ নিতেন, আকাশে জ্যোতিষ্কদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। ছাত্রদের বিজ্ঞান শেখানোর তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন জগদানন্দ রায়কে। তিনি ছেলেদের গাছপালা, পোকামাকড়, জীবজন্তু ও গ্রহনক্ষত্রের খবরা খবর দিতেন।

সাহিত্য, নাট্য-সঙ্গীত চর্চা, চিত্রাঙ্কন ছিল আবশ্যকীয় কর্মতৎপরতা। এ ছাড়া ছিল ঋতুভিত্তিক নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গোড়া থেকেই কবি চেয়েছিলেন আনন্দের মধ্য দিয়ে বিদ্যা চর্চা।

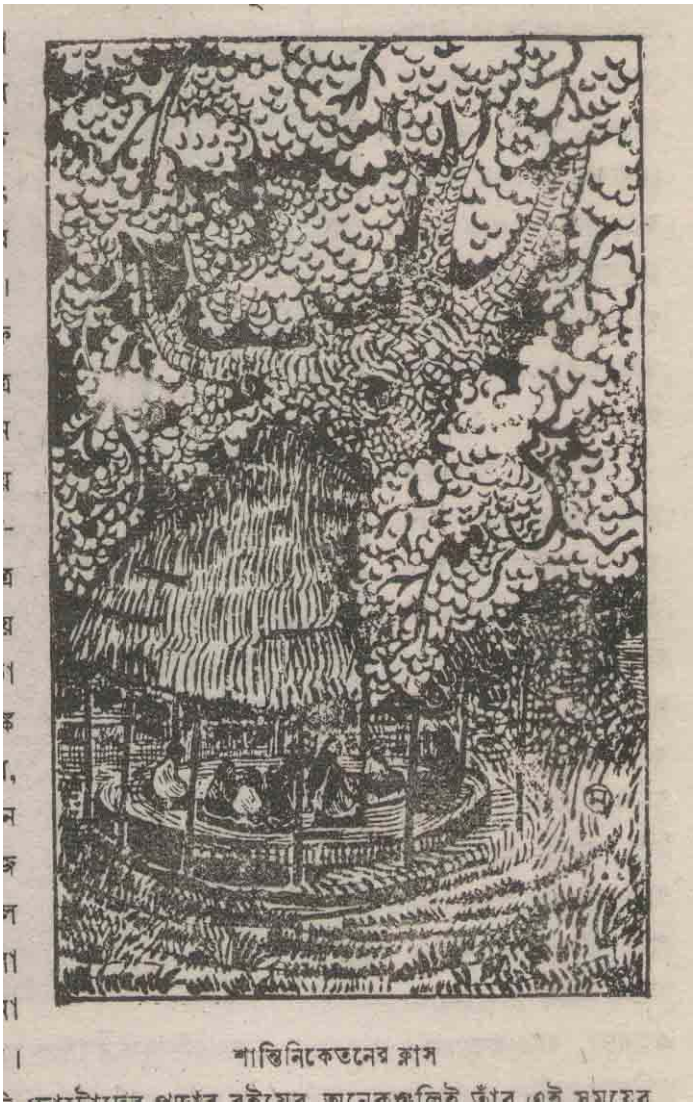

চিত্র ৪ : আদিতে বৃক্ষতলে শান্তিনিকেতনের ক্লাশ

শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্ররা কী ধরণের হওয়া উচিত তার একটি পরিচয় ঐ রচনাটিতে বলা হয়েছে :

> "আমাদের (গুর"দের) আশীর্বাদ মেঘে মিশে বৃষ্টিরূপে তোমাদের মাথায় পড়–ক, সুর্যকিরণে মিলে প্রতিদিন প্রভাতে তোমাদের চক্ষে এসে আবির্ভুত হোক, এবং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় শান্তি বহন ক'রে বায়ুর

সঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকুক। তোমরা সকলে কৃতী হও, শক্তিবান হও, নির্ভয় হও, নির্মল হও, ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে আত্মাকে সার্থক করো।"

হাতে কলমে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে কবি স্থাপন করলেন শান্তিনিকেতন থেকে কয়েক মাইল দুরে গ্রামে "শ্রীনিকেতন"- যেখানে স্থাপন করা হল শিল্পভিত্তিক নানা প্রতিষ্ঠান– বয়ন শিল্প, কাগজশিল্প, মুদ্রন, কৃষি প্রশিক্ষণ, খামার ও গোচারণভুমি এবং নানা ধরণের ছোটবড় কুটির শিল্প .. । 'শ্রীনিকেতন' হয়ে উঠল শান্তিনিকেতনের ল্যাবরেটরি– পরস্পরের সম্পুরক দুটি ইনস্টিটিউশন। শান্তিনিকেতন ও পার্শ্ববর্তী ভুবনডাঙ্গার স্থানীয় ভুমিপুত্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠির সাথে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-গুর" ও অন্যানদের স্থাপিত হল পরস্পর নির্ভর সম্পর্ক। সাঁওতালরা ছাত্রদের শেখালেন অপুর্ব প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্য, প্রকৃাতর রূপ– গাছপালা, জীবজন্তু ও আরণ্যক জীবনযাত্রা, স্থানিক লোকজ শিল্প-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এককথায় ছাত্ররা শিখল নৃতত্ব ও নৃবিজ্ঞানের গোড়ার কথা হাতে কলমে প্রকৃতির কোলে বসে।

ক্রমে ক্রমে দেশ বিদেশ থেকে এল অনেক খ্যতনামা পণ্ডিত ও মানবহিতৈষীর দল। শান্তিনিকেতন ক্রমেই পরিণত হল এক আন্তর্জাতিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। কবির সেই স্বপ্ন 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে – ..' অনেকটাই সার্থক হয়েছিল এখানে, কবির জীবদ্দশাতেই। শান্তিনিকেতনই হয়ে উঠেছিল কবি কল্পিত 'ভারততীর্থ', যে কবিতায় তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ঃ

যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দুরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ–
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে মহামানবের সাগর তীর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে নানা জাত ও বর্ণের, ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির, ভিন্ন ঐতিহ্য ও ইতিহাস ও বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্য ভরা মানুষ ভারততীর্থে মিলিত হবে, এবং রচনা করবে এক বৈশ্বিক মহামানব।* রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

* এই মহামানব বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, ও তার রূপ ও প্রকৃতি কী হবে তা তিনি আইনস্টাইনের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির ও ভৌত বাস্—বতা নিয়ে আলোচনায় তুলে ধরেছিলেন। দ্রষ্টব্য মুক্তমনায় আমার লিখিত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আলাপচারিতাঃ ভৌত বাস্—বতার প্রকৃতি' (www.mukto-mona.com)। এই মহামানব প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি ১৯৩৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে প্রদত্ত 'The Religion of Man' শিরোনামে হিবার্ট বক্তৃতামালায় আলোচনা করেন।

> "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট'; তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। .. .. সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবনসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়।"

সহজ পাঠের ১ম ভাগে বাংলা যে সব বর্ণের সাথে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে স্বরবর্ণ রয়েছে ১১টি, ঋ'কে অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে ৩৩টি; তিনি ক্ষ'কেও স্থান দিয়েছেন এতে। চন্দ্রবিন্দু (ঁ), অনুস্বর (ং) ও বিসর্গ (ঃ) কে বর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি, উ"চারণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, অথচ ঙ ও ঞ কে বর্ণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ঐতিহ্য অনুযায়ী। তিন 'শ ষ স' ও দুই 'ণ ও ন' রেখেছেন যথাযথ উ"চারণের প্রয়োজনে। ঠিক একইভাবে ই, ঈ এবং উ, দীর্ঘ উ রেখেছেন, অনেকের আপত্তি সত্তেও।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা বানান সম্পর্কে দু'একটি কথা

কবি সহজ পাঠগুলিতে বেশ কিছু শব্দের বানান লিখেছেন যা প্রচলিত বাংলা লেখায় ব্যবহার করা হতো না সেই কালে এবং অনেক সময় একালেও। আমরা কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি সহজ পাঠ থেকে। পাখি, গাড়ি, বাড়ি, শাড়ি, বুড়ি, তৈরি, বেশি, বেগনি, বাঁশি, রানী, কর্ণফুলি, পক্ষিরাজ ইত্যাদি। school এর বাংলা লিখেছেন ইস্কুল; college লিখতে গিয়ে অনেক সময় কালিজ আবার কলেজও লিখেছেন, লিখেছেন হাসপিতাল 'হসপিটালের' জায়গ্ায়।

কবি সহজপাঠগুলিতে অনেক শব্দের বানান লিখেছেন সে সময়ে প্রচলিত বানান'কে না মেনে। আমরা উপরে কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছি। তৈরী শব্দটি দুভাবেই লেখা হয়েছে (তৈরি, তৈরী)।

উ"চারণ ঃ ক'রে (কোরে – যাও এটি ক'রে নিয়ে এস), গ'ড়ে (খেয়াল মত দেয়াল তুলি গ'ড়ে), চ'ড়ে, ধ'রে, প'ড়ে (তিনি ধপাস করে প'ড়ে গেলেন), ভ'রে, ওড়ে (উড়ে নয়), ক'ষে, ব'লে, ধরো, বড়ো (বড়), দেখো, দিয়ো, রেখো, খই (খৈ) বোঝে (বুঝে), এসো (এস), গেছে (গ্যাছে), দেখি নে। খাইয়ে, বোলো (আর বোলো না ওর কথা), বলো (বল, ওকে বলো এখানে আসতে), ভালো (ভাল), নিয়ো (নিও), রেখো (রেখ), হ'ল, হ'লে, ব'লে, চ'লে, বড়ো, উপর, মতো, পিটোয় (পিটায়), নীচে (নিচে নয়), ফলের ঝোড়া (?), জানো (জান), ওই (ঐ), কালো, করেছে, ধরেছে (ধ'রেছে নয়), মাদোল (মাদল), গোর"গাড়ি (গর"গাড়ি), ভরি, পরিয়ে (প'রিয়ে নয়), যাব (যাবো নয়), করলেন, হতে, দিল, এল, পড়ছে, দেখলে, বাঁধলে, গেল, ধরেছিল, দেয়াল

(দেওয়াল), দরোজা (দরজা), পড়ে (পাঠ, জল গড়িয়ে পড়ে, পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে), কখনো, শোনো, ওই, ঐখানেতে, করবে, কোরো না (ক'রোনা নয়), কারো, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ সহজ পাঠ বইগুলিতে শব্দ উ"চারণের সহায়তার জন্য কিছু প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সহজ পাঠের দ্বিতীয়ভাগের ভুমিকার এক স্থানে বলা হয়েছে আমাদের উ"চারণে "কোরে, বোলে, হোলে" প্রভৃতি শব্দগু"ছ লেখা হয়েছে এভাবে ক'রে (যাও এটি ক'রে নিয়ে এস), ব'লে (সঞ্জীবকে ব'লে দেব, তোমার জন্যে মিষ্টি এনে দেবে), হ'লে (রোজ সকাল হ'লে শহরের দিকে চ'লে যাই)। কোরে এভাবে লেখা হলেও, কোরেছে উ"চারণ বুঝাতে ক'রেছে লেখা হয় নি, লেখা হয়েছে করেছে (আজ বাদল করেছে)। কোরবেন বা ক'রবেন লেখা হয় নি – লেখা হয়েছে করবেন (বিনোদ বাবু আজ লেখাটি শেষ করবেন), আমরা যা সচরাচর লিখে থাকি। উপরে কিছু উদাহরণ তুলে আনা হয়েছে সহজ পাঠের বইগুলি থেকে। এর কৈফিয়ৎ হিসেবে বলা হয়েছে– "বিশেষ উ"চারণ যেখানে সহজেই বুঝতে পারা যায়, অনাবশ্যক বোধে এই চিহ্ন (ঊর্ধ কমা চিহ্ন (‘) ব্যবহার করা হয় নি।" দেখ, রেখ, জান, ইত্যাদি লিখেছেন যথাক্রমে– দেখো, রেখো, জানো। আবার "দিল, এল, গেল .. " প্রভৃতি অনেক শব্দ লিখলেন না "দিলো, এলো, গেলো .. " রূপে। আমরা সাধারণভাবে যে শব্দগুলোর শেষ বর্ণটি ও-কারান্ত উ"চারণ করি সেগুলোর শেষ অক্ষরটিকে ও-কার (‘ো’) যুক্ত করে বানান লিখেছেন তিনি – যেমন ভালো (ভাল), সারানো (সারান), বোঝানো (বোঝান), শোনানো (শোনান) ইত্যাদি।

ক'রে আবার শুধু ‘করে’ আকারে লিখলে ক'এর উ"চারণ ও-কারান্ত হবে না, যেমন "জুতা মসমস শব্দ করে, বা মাছি ভন ভন করে"। উপরে কিছু উদাহরণ তুলে আনা হয়েছে সহজ পাঠের বইগুলি থেকে। রবীন্দ্র উ"চারণ প্রণালীতে অনেক শব্দ অপরিচিত ঠেকে– যেমন ‘গর"গাড়ী রূপান্তরিত হয়েছে ‘গোর"গাড়ি’, সাঁওতালদের ‘মাদল’ রূপ পেয়েছে ‘মাদোল’ এ। দুর নির্দেশক কিছু বোঝাতে যেমন একদিকে ‘ঐ’ ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যদিকে ‘ওই’ও ব্যবহৃত হয়েছে পাশাপাশি। যেমন, "ঐখানে মা পুকুর পাড়ে .., আবার "তেপান্তরের পার বুঝি ওই .. .. মনে ভাবি ঐখানেতেই আছে রাজার বাড়ি"। আমরা লিখি ‘উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ’, আর সেই খৈ রবীন্দ্রনাথের হাতে হয়ে ওঠে – "আঁচলেতে খই নিয়ে তুই, যেই দাঁড়াবি দ্বারে; অমনি যত বনের হরিণ, আসবে সারে সারে।" কিন্তু তিনিই আবার ‘কই’ মাছ লিখতে লিখেছেন কৈ, যেমন "থালা-ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ"। সম্ভবতঃ কই লিখলে যদি কেউ ‘কোই’ উ"চারণ না করে অ-কারান্ত ‘কই’ উ"চারণ করে, অথবা ‘কোথায়’ অর্থে বুঝে ফেলে, তাই এই সতর্কতা।

আমরা, বিশেষ করে পুর্ববঙ্গীয় বাঙালরা, অনেক ক্রিয়াপদ উ"চারণ করি অনেকটা য়+া যুক্ত করে – যেমন দ্যাখো (দেখ), ব্যালা (বেলা), ব্যাড়াতে (বেড়াতে) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এধরণের উ"চারণ বিশিষ্ট শব্দগুলির লিখার জন্য 'ে' দিয়েই লিখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রচনাগুলি কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী আঞ্চলিক কথ্য ভাষার শৈলীতে রচিত, আর এজন্যই গিয়েছিনু, দেখিনু, দেখি নে, নৌকো, গেলুম, এলুম, গিয়েছিলেম, দিলে (সে ভয়ে চম্স্লট দিলে), প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। আবার প্রমাণ শব্দ 'দিল' ব্যবহার করেছেন (বাকি দুজনে দিল দৌড়)। প্রমাণ চলিত লেখ্যভাষায় এ ধরণের শব্দ সাধারণত ব্যবহার হয় না। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভাষা হল সরল চলিত 'সাধুভাষা', যেমন কালান্তরের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের ভাষা সাধু - "সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।" (বিবেচনা ও অবিবেচনা, কালান্তর); আবার বেশী সংখ্যক প্রবন্ধের ভাষা প্রমাণ চলিত। 'বিশ্বপরিচয়' তো প্রাঞ্জল চলতি ভাষাতেই সরস শৈলীতে লেখা।

রবীন্দ্র রচনায় কি ও কী এর ব্যবহার

কি শব্দটি সর্বনাম হিসেবে ব্যবহার হয় এবং অব্যয় হিসেবেও। অব্যয় হল লিঙ্গ ও কারক ভেদে যে সব শব্দের রূপান্তর ঘটে না (ন + ব্যয় = অব্যয়), যেমন উপসর্গ সমুহ – প্র, পরা, অপ ..। (১) যেমন কোন বস্তু বা বিষয়ের সর্বনাম হিসেবে, সাধারণতঃ প্রশ্নবোধক বাক্যে কি এর ব্যবহার আমরা করে থাকি। উদাহরণ – 'তোমার নাম কি, তুমি খাবে কি?' কিছু না বা নাই অর্থেও কি এর ব্যবহার হয়ে থাকে, যথা – 'কি জানি', 'আমার সাধ্য কি' অথবা 'কি আর বলিব'। (২) বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ রূপেও এর ব্যবহার রয়েছে, যথা – 'কি (কান) বই পড়', 'কি (কমন) করে ঘটল', 'কি (কত) গুর"দক্ষিণা পেলেন পুর"ত মশাই' ইত্যদি। এখানে কোন্, কেমন ও কত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আনন্দ, বিরক্তি, বিস্ময় ইত্যাকার মনের ভাব বেঝাতেও কি ব্যবহার করে থাকি আমরা, যেমন ঃ 'কি চমৎকার! গান গেয়ে তো সবাইকে মাতিয়ে তুললে হে', 'কি সর্বনাশ !, তোমার তো সমুহ বিপদ', 'কি জ্বালা, আমার হয়েছে মরণদশা' .. । (৩) অব্যয় হিসেবে সংশয়প্রকাশী প্রশ্নেও এর ব্যবহার প্রচলিত, যথা – 'সেও কি আসবে, অথবা ও কি পারবে'। কিংবা, অথবা অর্থপ্রয়োগেও রয়েছে কি এর প্রচলন – 'কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক সবাই এসেছে রাজার দান গ্রহণ করতে', ...।

সংস্কৃতে 'কিম' শব্দ দিয়ে এ কাজগুলো সারা হয় – 'অথঃ কিম' (এরপর কি ?)। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু 'কি' যুক্ত বাক্য পাওয়া যায়, এরা বিভিন্ন অর্থ বহন করে। রবীন্দ্রনাথ এ দিকটির প্রতি

সর্বপ্রথম সুধীজন, ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রবর্তিত বাংলা ভাষায় প্রথম দিকে সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ একটি মাত্র 'কি' দিয়েই কাজগুলো সারা হতো। রবীন্দ্রনাথ অর্থভেদে কি এর সাথে কী এর ব্যবহার চালু করেছিলেন তাঁর লেখায়। সংসদ অভিধানে বলা হয়েছে " কী - 'কি' শব্দের উপর বেশী জোর বুঝাইতে কেহ কেহ এই বানান ব্যবহার করেন। যেমন 'তোমার কী চাই?', কী যে তুমি বলছ, মাথামুণ্ডু বুঝি নে?, বা 'ওই দিকে কী দেখিতেছ ?' ইত্যাদি। এই 'কেহ কেহ'র মধ্যে কবি ছিলেন অগ্রগণ্য, তবে শুধু 'কি' এর ওপর জোর দেয়ার জন্য নয়, অর্থ ও ব্যঞ্জনার স্বার্থে দুই 'কি' এর (কি এবং কী) ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন। বিষয়টি বোঝাবার জন্য তিনি নানা উদাহরণ দিয়েছেন– যার সাক্ষাৎকার 'সহজ পাঠ'গুলোতেও বিধৃত। এ প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য শোনা যাক, ১৩৪৪ সালে শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

> "আপনার চিঠির একটা জায়গায় ভাষার ভঙ্গিতে মনে হল ক-এ দীর্ঘ ঈকার যোগে কী আমি ব্যবহার করে থাকি সে আপনার অনুমোদিত নয়। আমার বক্তব্য এই যে, অব্যয় শব্দ 'কি' এবং সর্বনাম শব্দ 'কী' এই দুটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকেলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন-কি, প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দুর হয় না। 'তুমি কি জানো, সে আমার কত প্রিয়' আর 'তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়', এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'ছে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হ'ছে জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাৎ না থাকলে ভাবের তফাৎ নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করা যায় না।"

সুতরাং বিশুদ্ধ অব্যয় হিসেবে ব্যবহার কালে আমরা 'কি' ব্যবহার করব আর সর্বনাম হিসেবে ব্যবহারে 'কী' ব্যবহার বিধেয়– এই ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কি ও কী' এর ব্যবহারের সাধারণ ব্যবস্থাপত্র। সুতরাং সংশয়, গভীরতা, পরিমান, কেমন, কোন ইত্যাদি বোঝাতে 'কী' ব্যবহার বাঞ্ছণীয়। অতএব আগের অনু'ছদের যে উদাহরণটি আমরা দিয়েছিলাম 'সেও কি আসবে, অথবা ও কি পারবে ?' তা রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী দাঁড়াবে 'সেও কী আসবে, অথবা ও কী পারবে ?' তাই 'কি জ্বালা, আমার হয়েছে মরণদশা' হবে 'কী জ্বালা, আমার হয়েছে মরণদশা'। আর একটি উদাহরণ দিই রবন্দ্রনাথ থেকে – "অহো, হিমালয়ের কী অপুর্ব গাম্ভীর্য "; এখানে কী ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণের বিশেষণ রূপে হিমালয়ের 'অপুর্ব গাম্ভীর্যের পরিমাণ বা গভীরতা বোঝাতে।

কবি পুনরায় ১৯৩১ সালে শ্রী জীবনময় রায়কে লেখা একটি চিঠিতে 'কি ও কী'র ব্যবহারের প্রসঙ্গ টেনেছেন কিঞ্চিত বিস্তৃত করে :

> "এইখানে আর-একটা আলোচ্য কথা আছে। প্রশ্নসুচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নবাচক সর্বনাম 'কি' উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত। আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ

> দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবার সুবিধা হয়। 'তুমি কি রাঁধছ' 'তুমি কী রাঁধছ' – বলা বাহুল্য এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি রাঁধছ কিনা, এবং তুমি কোন জিনিস রাঁধছ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে। যদি দুই 'কি'-এর জন্যে দুই ইকার বরাদ্দ করতে নিতান্তই নারাজ থাক তা হলে হাইফেন ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত ঃ 'তুমি কি রাঁধছ' এবং 'তুমি কি-রাঁধছ'। এই পর্যন্ত থাক।"*

'কি ও কী'র ব্যবহার নিয়ে সহজপাঠ থেকে কয়েকটি উদাহরণ টানি। শিশুদের মনে যাতে প্রথম থেকেই এই ভেদ বোঝান যায় এ জন্য সহজ পাঠের প্রথম ভাগেই 'কি ও কী'এর অবতারনা করেছেলেন। দৃষ্টান্ত ঃ 'ভাই ঘড়ি আছে কি?', 'এ কী পাখি ? এ যে টিয়ে পাখি', 'ও পাখি কি কিছু কথা বলে?' 'ও কী খায়? ও খায় দানা', পাখি কি ওড়ে? না পাখি ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি।' এ ধরণের অনেক উদাহরণ দিয়েছেন তিনি।

(১ম অংশের সমাপ্তি, পরবর্তী অংশে আমরা ইংরেজী সহজ পাঠ ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন সহ কবি-মনের শিক্ষা ভাবনার নানা দিক তুলে ধরব)

চলবে

* বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৯১।